রূপে অরূপে বিবেকানন্দ

সম্পাদক
সৌমেন রক্ষিত
দেবব্রত মণ্ডল

প্রকাশক :
গ্রন্থবিকাশ
৫৯/১এ, পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

গ্রন্থস্বত্ব : সৌমেন রক্ষিত

প্রথম সংস্করণ :
আগস্ট, ২০১৪

প্রচ্ছদ :
দেবব্রত সাঁতরা

বর্ণসংস্থান :
প্রিন্ট ম্যাক্স

মুদ্রক :
স্পেকট্রাম অফসেট
৫বি, কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০৩৭

ISBN 978-93-83018-19-2

সূচী

স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারায় ভারতের সামগ্রিক উত্থান	রুহিদাস বণিক	৭
বিবেকানন্দ ও জাতীয়তাবাদ	অভিষেক মুসিব	২৪
জাতিভেদ প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ—কিছু ভাবনা	দেবব্রত মণ্ডল	২৮
বীররসের কাব্যধারায় বিবেকানন্দ ঃ একটি আলোচনা	সৌমেন রক্ষিত	৩৬
স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তার প্রাসঙ্গিকতা	বিশ্বরূপ দে	৪৩
প্রগতির পথে বিবেকানন্দ	তনুশ্রী দে	৪৮
স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের প্রয়োগ	অনুপ কুণ্ডু	৫৩
'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' অবলম্বনে বিবেকানন্দের ইতিহাস ভাবনা	অনুরূপা মুখোপাধ্যায়	৬৩
Towards Self-realization	Manoj Kumar Murmu	৬৬
Poet Swamiji	Atanu Kundu	৬৯
বিবেকানন্দ আজও মনোভূমে বিরাজমান	সিদ্ধার্থ দত্ত	৭৭
লেখক পরিচিতি		৭৯

বিবেকানন্দ ও জাতীয়তাবাদ

অভিষেক মুসিব

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জাতীয়তাবাদী ভাবনাকে প্রকাশ করতে গিয়ে নেশন শব্দটিকে একটু ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছিলেন। তিনি Nation সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছিলেন — "A Nation in the sense of the Political and economic union of a people, is that aspect which a whole population assumes when organised for a mechanical purpose." রবীন্দ্রনাথের মত বিবেকানন্দও মূলত ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীন ঐতিহ্যময় সংস্কৃতির রূপটিকে তুলে ধরতে চেয়েছেন তাঁর জাতীয়তাবাদী ভাবনা চিন্তার মধ্য দিয়ে। জাতীয়তাবাদ বলতে আমরা যা বুঝে থাকি বিবেকানন্দ সেই অর্থে কতটা জাতীয়তাবাদী নেতা সেই প্রসঙ্গে হয়তো অনেক তর্ক ও সমালোচনার জন্ম দেবে। কিন্তু 'জাতীয়তাবাদ' শব্দটিকে বৃহত্তর অর্থে অর্থাৎ শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, সমাজ তথা রাষ্ট্রীয় গণচেতনার দিক থেকে যদি দেখা যায় তাহলে নরেন্দ্রনাথ দত্ত অবশ্যই একজন জাতীয়তাবাদী নেতা। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের নাম একসঙ্গে উচ্চারিত হতে কোন বাধা থাকে না। তিনি বাংলার মুক্তিপথের অগ্রদূত। দেশমাতাকে জাতীয়তার মন্ত্রে দীক্ষিত করে নতুন শৃঙ্খলমুক্ত সমাজ গড়ার কারিগর হিসাবে চিহ্নিত। আপামর বাঙালিকে দিয়েছিলেন ঐক্যবদ্ধতার সুর। উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য রেনেশাঁসের আলোকে যখন ভারতবর্ষে লেগেছে নবচেতনার উদ্দীপনা ও উন্মাদনা, জাগরণের ঢেউ সেই জাগরণের সুরেই বিবেকানন্দ দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। পাশ্চাত্যের নেশন মূলত সাম্রাজ্যবাদ থেকে আগত। পাশ্চাত্যে নেশন ও রাষ্ট্রগুলি প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির রূপ ধরে গড়ে ওঠেনি, মূলত সেখানকার পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। কিন্তু পাশ্চাত্যের জাতীয়তাবাদের হাত ধরে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠলেও সংস্কৃতির ভূমিকা সমানভাবে ক্রিয়াশীল। স্বামী বিবেকানন্দ জাতির সংস্কৃতি তথা দেশের ঐতিহ্যকে স্মরণ রেখেই জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। বিবেকানন্দের জাতীয় চেতনায় শুধুমাত্র দেশমুক্তির কথা ছিল না তার সঙ্গে জড়িত ছিল সমাজবোধ, ধর্মবোধ ও জীবনবোধ এগুলিকে তিনি একত্রে মেলাতে পেরেছিলেন। বিবেকানন্দের সমাজবোধ শুধুমাত্র দক্ষিণেশ্বর চত্তর ও শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করেই সীমিত থাকেনি, এর জন্যে তিনি যথেষ্ট অধ্যাবসায় করেছিলেন। প্রথম যৌবনে পাশ্চাত্য দার্শনিক ও লেখকদের যথা মিল বেন্থাম স্পেনসার প্রভৃতিদের বই পড়ে আর পরে ভারতবর্ষের পথে পথে ঘুরে বেড়িয়ে দরিদ্র আর্ত পীড়িত শ্রমজীবি মানুষদের সংস্পর্শে এসে তিনি তার শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করে তুলেছিলেন। ভারতবর্ষের শ্রেণীবিভেদ, আচার বিচার, জাতপাত প্রভৃতি বিষয়গুলি যে এদেশের উন্নতির প্রথম বাধা তা বিবেকানন্দ অচিরেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। জাতপাতের মধ্য দিয়ে যে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র ভাবধারা গড়ে উঠেছিল তার বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে ১৮৯৪ খ্রিঃ ১৯ শে মার্চ

রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা একটি চিঠিতে জানান—"যে দেশে কোটি কোটি মানুষ মহুয়ার ফুল খেয়ে থাকে আর দশ বিশ লাখ সাধু আর ক্রোর দশেক ব্রাহ্মণ ঐ গরিবদের রক্ত চুষে খায়, আর তাদের উন্নতির কোনও চেষ্টা করে না, সে কি দেশ না নরক! সে ধর্ম না পৈশাচ নৃত্য! দাদা, এটি তলিয়ে বোঝ—ভারতবর্ষ ঘুরে ঘুরে দেখছি। এ দেশ দেখছি। কারণ বিনা কার্য হয় কি?"

শুধুমাত্র জাতিভেদ প্রথা নয়, তিনি দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বিরুদ্ধেও সোচ্চার হয়েছেন। এই System (ব্যবস্থা) থেকে বের হতে না পারলে যতই স্বাধীনতা, স্বাধীনতা বলে চীৎকার উঠুক না কেন তাতে যে ভারতবর্ষের মুক্তি সম্ভব নয় তা তিনি ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যে স্বাধীন উন্মুক্ত চিন্তার প্রয়োজন একথা অনুধাবন করেই তিনি বিভিন্ন সংস্কারগুলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হেনেছেন। পুরোহিততন্ত্রের নষ্টামির বিরুদ্ধে বলেছেন —

"আর্য বাবাগনের জাঁকই কর, প্রাচীন ভারতের গৌরব ঘোষণা দিনরাতই কর; আর যতই কেন তোমরা 'ডম্‌ম্‌ম্' বলে ডম্ফই কর, তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেঁচে আছ? তোমরা হচ্ছ দশ হাজার বছরের মমি।। যাদের 'চলমান শ্মশান' বলে তোমাদের পূর্বপুরুষেরা ঘৃণা করেছেন, ভারতে যা কিছু বর্তমান জীবন আছে তা তাদের মধ্যে।

('ভারত—বর্তমান ও ভবিষ্যৎ'/পরিব্রাজক)

বিবেকানন্দের ভারতবর্ষে জাতীয় চেতনা প্রসারের মূল উদ্দেশ্য ছিল ধর্মে একবিন্দু আঘাত না করে জনসাধারণের উন্নতি সাধন। উল্লেখ্য এখানে ধর্ম শব্দটি বিশেষ কোন সংকীর্ণ চেতনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিকাগো ধর্মসভায় তিনি সেই সার্বজনীন ধর্মের কথাই বলেছিলেন — "সেই ধর্ম শুধু ব্রাহ্মণ্য বা বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান বা মুসলমান হবে না। সেই ধর্ম সব ধর্মের সমষ্টিস্বরূপ হবে পৃথিবীর সব নরনারীকে তা আলিঙ্গন করবে।" আমাদের মনে রাখতে হবে রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের যুগেও যে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র দেশের কণ্ঠ চেপে ধরেছিল উনিশ শতকের শেষ লগ্নে দাঁড়িয়ে বিবেকানন্দ ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকে শুধুমাত্র বাংলার মধ্যেই সীমায়িত রাখেননি, দক্ষিণ ভারতেও প্রসারিত করেছিলেন। ভারতবর্ষের মূল সমস্যা বুঝতে তাঁর অসুবিধা হয়নি। দেশের মানুষকে সচেতন করতে হলে যেটি দরকার তা ছিল শিক্ষার আলোয় সবাইকে নিয়ে আসা, তাই দেখি প্রথাগত শিক্ষার বাইরে গণশিক্ষার প্রসারে বিবেকানন্দ অগ্রনী ভূমিকা পালন করেন। জমিদার পন্থী এলিট শ্রেণীর কংগ্রেসী ভাবধারায় যে ভারতবর্ষের উন্নতি সম্ভব নয় তা তিনি জানতেন—'একটা ছুঁচ গড়বার ক্ষমতা নেই, তোরা আবার ইংরেজদের Criticise করতে যাস, আহাম্মক! ওদের পায়ে ধরে জীবন সংগ্রামোপযোগী বিদ্যা, শিক্ষাবিজ্ঞান, কর্মতৎপরতা শিখগে। যখন উপযুক্ত হবি, তখন তোদের আবার আদর হবে। ...কোথাও কিছুই নেই, কেবল Congress করে চেঁচামিচি করলে কি হবে?

(স্বামি শিষ্য সংবাদ)

এককথায় বিবেকানন্দ গণতন্ত্রের উপর জোর দিয়েছিলেন। শিক্ষা বলতে তিনি বুঝেছিলেন

জীবন সংগ্রামের উপযোগী আত্মনির্ভরশীল শিক্ষা। জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্য সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ উভয়ের মূলগত সাদৃশ্য বর্তমান। উভয়েই পাশ্চাত্য সভ্যতার সাম্রাজ্য লোলুপতাকে আক্রমণ করেছেন আবার অন্যদিকে হিন্দু সভ্যতার যে বর্ণাশ্রম প্রথা প্রচলিত ছিল তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ না করলেও তার পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন যদিও পরবর্তীকালে বর্ণসমাজ সম্পর্কে দুজনেরই ভাবনার পরিবর্তন ঘটে। স্বামী বিবেকানন্দ শুধুমাত্র একজন ধর্মপ্রচারক নয়, সমকালীন জাতীয় নেতৃবৃন্দের কাছে তিনি একজন জাতীয় নেতা রূপেও পরিচিত। বিবেকানন্দ সে অর্থে কোনও বিশেষ জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত না হলেও ভারতবর্ষের উন্নতি সাধনের প্রয়াসে বিশেষত শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য বা সমাজসেবার দিক থেকে তিনি অবশ্যই একজন আদর্শ নেতা রূপে স্বীকৃত। সমকালীন জাতীয় নেতৃবৃন্দ তাঁর কর্মপ্রয়াসকে বিপ্লবী কার্যকলাপের সঙ্গেই তুলনা করেছেন। বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর তাঁর মূল্যায়ন প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত বেঙ্গলী পত্রিকা জানায়—"মানবজীবন যে সমন্বিত বস্তু, কোন একটি দিকে তার অগ্রগতি মানে সমগ্রেরই গতি, যার আবেগস্পন্দন সমগ্র দেহকেই কম্পান্বিত করে থাকে—এই মহাসত্য সম্বন্ধে বিবেকানন্দ পূর্ণ সচেতন ছিলেন। সার্থকতম অর্থে তিনি দেশপ্রেমিক।" ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের মধ্যে অন্যতম অ্যানি বেশান্ত ৮ই মে ব্রহ্মবাদিন পত্রিকার বিবেকানন্দ সংখ্যায় বলেন—"ভারতীয় গণজীবনে স্বামী বিবেকানন্দ বীর্যের অবতার। নিজ জীবনে তিনি সমকালের শক্তিসমূহকে উদ্বোধিত করে জড়বাদের উপর মৃত্যু প্রহার দিয়েছিলেন।" অন্যত্র কমনউইল পত্রিকায় ১৯১৭ সালের ১৯ই জানুয়ারী অ্যানি বেশান্ত ভারতের জাতীয় আন্দোলনে স্বামীজীর প্রভাব প্রসঙ্গে লেখেন—"How the great Swami would have rejoiced to see the life now surging through his beloved India. His pride in the motherland and his passionate love for her, shone out from time to time in his lectures, and always irradiated his thought and life." বিবেকানন্দ সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র পালের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য। অ্যানি বেশান্ত সম্পাদিত 'কমন উইল' পত্রিকায় ১৩ আগষ্ট ও ১ সেপ্টেম্বর ১৯১৬ এই দুই সংখ্যায় ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে বিবেকানন্দের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন—"আমদের ক্ষেত্রে বিজয়ের আন্দোলন অবশ্যই হয়েছিল চিন্তাজগতে ও নৈতিকজগতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নয়। আর এই বিজয় অভিযান স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে যুক্ত— বিবেকানন্দই আধুনিককালে ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রথম হিন্দু মিশনারি। তাই এদেশের আধুনিক জাতীয়তার ইতিহাসে তাঁর অত্যুচ্চ স্থান।" তিনি আরও জানান—"কতকগুলি দিক দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে অবশ্যই দাবি করা যাবে—তিনি আমাদের জাতীয়তার সর্বশ্রেষ্ঠ ·'গারক ও প্রফেট। তিনিই প্রথম আমাদের দেশ ও তার সংস্কৃতির পক্ষে জ্বলন্ত বাসনার সুর তুলোছলেন, তীব্র অনুভূতিময় সেই দেশপ্রেম যা গত দশকের জাতীয়তাবাদী প্রচারের মধ্যে প্রধান আশ্রয় হয়ে উঠেছিল।"

সমকালীন বিভিন্ন জাতীয় নেতৃবর্গের কাছে স্বামী বিবেকানন্দ জাতীয় বীর রূপেই চিহ্নিত। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিবেকানন্দের প্রভাব কোন অংশে কম ছিল না, এই

মহান দার্শনিকের জাতীয়তাবোধ কোন সংকীর্ণ রাজনীতিতে আবদ্ধ ছিল না, তাঁর জাতীয়তাবাদ কোন রাজনৈতিক খাতে প্রবাহিত হয় নি। তিনি কোনদিনও প্রকাশ্য রাজনীতিতে নামেন নি— যদিও তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতায় ও চিঠিপত্রে উগ্র রাজনৈচিক মতামত প্রকাশ পেয়েছে। তা সত্ত্বেও রাজনৈতিক বার্তাকে দূরে সরিয়ে রেখে পাশ্চাত্যের দরবারে অবনত ভারতবর্ষকে উন্নীত করাই ছিল তাঁর একমাত্র সাধনা। ভারতবর্ষের মুক্তির জন্য তিনি 'মানুষ' চেয়েছিলেন— মানুষ, খাঁটি অপকট চরিত্রবান মানুষ। সমাজতন্ত্রী বিবেকানন্দ বিশেষ কোন ধর্মের ধ্বজা তুলে ধরতে চাননি, যা চেয়েছিলেন তা হল সমগ্র ভারতবর্ষের উন্নতিবিধান। দেশকে তিনি নতুন রূপে দেখতে চেয়েছিলেন—'নূতন ভারত বেরুক, বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে-মালা-মুচি-মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে, বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে, বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে, বেরুক ঝোড়-জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে।" এই দেশমাতার জন্য যুবসম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর আহ্বান ছিল অন্যান্য দেবদেবীদের বাদ দিয়ে আগামী পঞ্চাশ বছরের জন্য ভারতমাতাই যেন সবার একমাত্র আরাধ্যা দেবী হন। বিদেশী শাসনের অধীনে নির্যাতিত হীনমন্য মুমূর্ষু দেশবাসীকে আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান করে তোলার প্রথম অগ্নিমন্ত্র যদি কেউ জাগিয়ে থাকে তবে তিনি হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দই আমাদের জাতীয় জীবনের রূপকার।